‘কেমন যুগান্তর চাই’

তেইশ বছর ধরে পড়ছি দৈনিক যুগান্তর। প্রকাশের প্রথম দিন থেকেই একটানা পড়ছি। আবার বেশ কয়েকদিন থেকেই পড়ছি, ‘কেমন যুগান্তর চাই’। এ প্রশ্নের উত্তর অল্প কথায় দেওয়া আমার পক্ষে মোটামুটি অসম্ভব। তাই অযথা ঢাকঢাক-গুড়গুড় না করে কিছুটা হলেও মনের চাওয়া-পাওয়া খোলামেলা প্রকাশ করতে চাই। এ বিষয়ে সংবাদপত্রের ভূমিকা কী হওয়া উচিত, কেমন হওয়া উচিত, সে ভাবগম্ভীর আলোচনা অনেক লম্বা– সে-দিকে যেতে চাচ্ছিনে। কোনো না কোনোভাবে যুগান্তরকে ভালো লাগে বলেই এতটা বছর ধরে যুগান্তর পড়ে আসছি। আবার যুগান্তরের কাছে আমার অনেক চাওয়া-পাওয়া আছে, এটাও সত্য। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যুগান্তর চব্বিশ বছরে পা দেবে। ভাবতে অবাক লাগে, দেখতে দেখতে দু-যুগে চলে এসেছে। কিভাবে সময় উড়ে চলেছে! দু-যুগ সময়টা একেবারে কমও নয়। বলা যায়, যুগান্তর সময় ও চাওয়া-পাওয়ার ধোপে উতরে গেছে। পাঠকের মনের গভীরে স্থান করে নিয়েছে।

পত্রিকা একটা বহতা নদীর মতো। নদী তার বুকে-ধরা প্রাঞ্জল-জঞ্জালে ভরা অসীম জলরাশি ভাসিয়ে নিয়ে নিঃসীম সাগরে মিশে নিজেকে উজাড় করে দেয়। পত্রিকা প্রতিদিনের সমাজ ও জীবনের ভালো-মন্দ, দুঃখ-আনন্দভরা ঘটনাসম্ভার বুকে নিয়ে কালের নিরন্ত ক্রোড়ে পুঞ্জিভূত করে। তবে তাকে অনাগত ভবিষ্যতের কাছে অতীত কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। সমাজ ও জাতির বিবেক হিসেবে যুগান্তর উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করুক– এটা আমরা চাই। যুগান্তর সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের বিপরীতে করা সব মতলব ও ভাঁওতাবাজির ঘোমটা উম্মুক্ত করে দিক– তাও আমরা চাই।

আমি একজন শিক্ষক। সচেতন জনগোষ্ঠীর একজন। আমার লেখা যুগান্তরে ছাপা হয়। লেখায় আমাকে শিক্ষকতা পেশার প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। সেজন্য রাজনৈতিক পঙ্কিল নোংরামীতে, চাটুকারিতার তেলবাজিতে কোনোক্রমেই নিজেকে ডোবানো উচিত নয়। তাতে পেশার কলঙ্ক বাড়ে। উচিত নয় কোনো বাতিল মতবাদে নিজেকে সিক্ত করা। উচিত নয় নিজের পেশার অস্তিত্ব ও আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে চলতি সমাজের কর্দমাক্ত স্রোতে ভেসে যাওয়া। তেমনি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক হিসেবে উচিত নয় যুগান্তরের গায়ে কোনো রঙিন কাদা লাগা; অন্যায়ের স্রোতে নির্বিবাদে যুগান্তরের ভেসে যাওয়া। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার মতবাদই ‘যুগান্তর’-এর ‘ভিতর-বাহির’ মতবাদ হওয়া উচিত। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষ কিন্তু মুসলমান। যুগান্তরের উচিত না প্রকাশ্যে কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে তথাকথিত প্রগতিশীলতার দোহায় পেড়ে ধর্মের পিছনে আদা-জল খেয়ে লাগা। অনেক অপ্রিয় সত্য কথা বলছি। গোঁড়ামি ও কুসংস্কার পদদলিত করে যুগান্তর হয়ে উঠুক ধর্মীয় মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সত্যের প্রতীক। যুগান্তর মিশে যাক জনারণ্যে। দেশ একসময় পাকিস্তানের শাসনাধীন ছিল। তখন পূর্ব-পাকিস্তানের কোনো পত্রিকার ভূমিকা একরকম ছিল। তখন এ দেশের কয়েকটা পত্রিকা দেশ-মাতৃকার মুক্তির জাগরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল, যা ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। তখন যুগান্তরের জন্ম হয়নি। একটা পত্রিকার ভূমিকা সব সময় এক হয় না। বাংলাদেশ এখন স্বাধীন-সার্বভৌম একটা দেশ। এখন কোনো জাতীয় পত্রিকার ভূমিকা পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন আর ভাষার জন্য যুদ্ধ করা লাগবে না, তবে ভাষা রক্ষা ও উন্নতির জন্য যুদ্ধ করা লাগতে পারে। যুগান্তরের দায়িত্ব হবে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, স্বদেশমাতৃকা পাহারায় অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করা। অন্য কোনো দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, মতবাদকে এ দেশের মানষের মাথায় চাপিয়ে না দিয়ে দলমত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই সার্বভৌম ভুখণ্ডের জনগোষ্ঠী, সমাজ, স্বদেশ-সংস্কৃতি, ভাষা, দেশীয় মূল্যবোধ, মানুষের মানবিকতাকে বড় করে দেখা। এ দেশের মানুষ, মনুষ্যত্ব ও সমাজের কথা বলা। কোনো জটিল-কুটিল রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি না করা। তোষামোদবাদ পরিহার করা। দলবাজ, তোষামোদকারী লেখকদের এড়িয়ে চলা। গণমানুষের মনের কথা বলা। শিক্ষা ও দেশসেবার মানসিকতা নিয়ে দেশসেবকদের খুঁজে বের করা। তাঁদের পাশে

দাঁড়ানো। ক্ষুরধার লেখনী দিয়ে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করা। পত্রিকার পৃষ্ঠাতে তাঁদের ঠাঁই করে দেওয়া। এ দেশের জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপ দেয়ার সামাজিক আন্দোলনে শরীক হওয়া। এ দেশের রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও মানসিক কুপমণ্ডকতাকে পিছনে ঠেলে দেশ ও জাতির উন্নতি ও উৎকর্ষের মনোজাগতিক রূপরেখা ভাষায় এঁকে তা জনসমক্ষে প্রচার করা, দূরদর্শীতার পরিচয় দেওয়া।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর অনেকগুলো 'বাদ' এসে এ দেশে একযোগে জায়গা করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলেছিল। কেউ 'বামবাদ', 'রাশিয়াবাদ', 'চৈনিকবাদ', 'পুঁজিবাদ'; আরো কত যে ফন্দি-ফিকির! আমাদের দেশে সে-সব 'বাদের' কিছু কিছু ঠাঁই দেওয়াতে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ অর্থনৈতিকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সে লোকসানের অনুরণন দেশ এখনো টেনে চলেছে। তাতে অনেক জনক্ষয় হয়েছিল, পারস্পরিক বিভেদ বেড়েছিল। অনেক পত্রিকা সে-সবের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। অনেকে মনে করে পত্রিকা মানেই কোনো না কোনো 'বাদ'-এর পাইরবি করা। আপাতত এসব বিদেশী 'বাদ'-এর ভূত পত্রিকার পাতা থেকে দূর হয়েছে ভাবলেও দেশীয় অনেক পুরোধার মাথা থেকে এখনো তা দূর হয়নি। তবে সময় পরিক্রমায় দেশ একটা 'বাদ'মুক্ত স্থিতিশীলতায় এসেছে বলা যায়। অর্থনৈতিক উন্নতিতেও দেশ অনেকটা এগিয়ে গেছে। এ দেশের মানুষ আর এইসব 'বাদের' মধ্যে যেতে চায় না। চায় দলমত-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-অহিংস একটা সমাজ। চায় মানসিকতার উন্নয়ন। তবে এদেশের গতরখাটা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানসম্মত শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থার উন্নতির (জীবনমান) জন্য জাতীয়-আয়ের সুসম বণ্টন বেশি প্রয়োজন। প্রয়োজন ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য যথাসম্ভব কমিয়ে নিয়ে আসা। এজন্য কোনো 'বাদের' দরকার নেই। স্বদেশী 'বাদ' দিয়েই যা সম্ভব। দরকার দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টননীতি ও ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেম-লসমুক্ত বণ্টনব্যবস্থা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, 'চাটামুক্ত' প্রশাসন, নৈতিকতা ও সততার সাথে দেশ পরিচালনা, যা এ দেশের কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব। যুগান্তরের মতো একটি মধ্যপন্থী জাতীয় পত্রিকা এসব দায়িত্বের মুখপত্র হিসেবে ভালোভাবেই অবদান রাখতে পারে। সে স্থিতিশীলতা ও সক্ষমতা দীর্ঘ তেইশ বছরে যুগান্তরের এসেছে। আমরাও যুগান্তরের ওপর আস্থাশীল।

বিশ্বে এমন কোনো দেশ আছে বলে আমার জানা নেই, যেখানে একাধিক ধর্মের লোক বাস করে না। এক ধর্মাবলম্বীদের এক দেশ– এমনটি আশা করা বাতুলতা। এ দেশ ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ। কোনো ধর্মীয় উন্মাদনা, ধর্ম-উচ্ছেদের মানসিকতা মনে পোষণ করে কেউ যত লম্ফঝম্প করুক না কেন, পরিণামে সবাইকেই শান্তির সাথে এ দেশে বাস করতে হবে। বুঝতে হবে, মানুষের ধর্ম না থাকলে অধর্ম সেখানে এসে বাসা বাঁধে। শান্তির সাথে বসবাস করতে হলে যার যে ধর্ম সে সেই ধর্ম শান্তির সাথে সম্প্রদায়-অহিংসভাবে পালন করুক– এমন মন-মানসিকতা আমাদের হওয়া উচিত। এ বিষয়টা যুগান্তরের মাথায় আছে জানি। ভবিষ্যতেও থাকতে হবে।

আমি শিক্ষক। শিক্ষার কথা আমার বলা উচিত। যুগান্তর চাইলে এ দেশে গুণগত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, মানবসেবার মনোভাব সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে। এ কাজে যারা জড়িত তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। এতে দেশের উন্নতি ও উৎকর্ষ বাড়ে। যুগান্তরেরও সামাজিক দায়িত্ব পালিত হয়। 'যুগান্তর' চলুক যুগযুগান্তর। এক অন্তর থেকে অন্য-জনান্তর। যুগান্তরকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

(১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর বাতায়ন কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– প্রফেসর, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক।